দরবারী আলিমদের মতে তাকফির

আশ-শাইখ আল্লামা নাসির ইবনু হামাদ আল-ফাহাদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহ বলেনঃ

শুনে রাখুন আমার মুসলিম ভাইয়েরা, অধিকাংশ আলিমরা দুঃখজনকভাবে তাকফিরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে মূলনীতি এতোদিন জানতেন না, তা হল যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যা তাকে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয় – সে কখনো শাসকদের একজন হতে পারে না। কারণ শাসকরা যে কুফর বা শিরকই করুক না কেন, তাদের তাকফির করা হলে আকাশ ভেঙ্গে পড়া এবং পর্বতমালা ধ্বসে পড়ার মতো অবস্থা হবে।

শাসকদের তাকফিরের ব্যাপারে এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দুটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছেঃ

১) যখন কোন শাসকের কোন কাজ কুফর বা শিরক আকবর হবার ব্যাপারে কুরআন-হাদিস থেকে স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায়, তখন হয় তাউয়িল (ব্যাখ্যা করা) করার মাধ্যমে অথবা ওই দলিলকে মানসুখ (রহিত) সাব্যস্ত করার চেষ্টার মাধ্যমে তাকফিরকে এড়িয়ে যেতে হবে।

২) শাসকদের যদি এমন কোন কাজ করে, যে কাজ ইসলাম বিনষ্টকারী হবার ব্যাপারে ইজমা' আছে, তাহলে এমন সব ইজমা'কে ভুল ধরে নিতে হবে। ইতিপূর্বে যে বিষয়ে ইজমা' ছিল, সেখানে ইখতিলাফ আবিষ্কৃত হবে। যেহেতু কাজটা শাসক করেছে।

আর বর্তমান সময়ে যাদের "ইলমের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ" গণ্য করা হয়, তারা ওপরের এই মূলনীতি দুটির ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন। আর যারা "অল্পবয়স্ক" এবং "বোকার স্বর্গে বাস করে" (সুফাহা'-উল-আহলাম)- তারাই কেবল এ গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি দুটির ব্যাপারে অজ্ঞ। এই মূলনীতির ব্যাপারে দলীল পাওয়া গেছে কুরআনের আয়াত, শারঈ মূলনীতি এবং নস থেকে প্রমাণ আহরণের (আল-ইস্তিকরা') মাধ্যমে।

কুরআন থেকে দলিল -

শাসকদের তাকফির করার ব্যাপারে “ইলমের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ” আলিমদের ইজমা থাকা ওপরের দুটি মূলনীতির ব্যাপারে কুরআন থেকে দলীল হল, নিজের অনুসারীদের প্রতি ফিরাউন যা বলেছিল, যে ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন -

“ফিরাউন বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই।“ [৪০:২৯]

একটি অন্যতম উসুলী মূলনীতি এই যে, নির্দিষ্ট বা বিশেষ অবস্থার বদলে আয়াতের সাধারণ (আম) অর্থকে গুরুত্ব দেয়া হবে। সুতরাং যদিও এ কথাটি মুসার আলাইহিস সালাম সময়কার ফিরাউন বলেছিল, তথাপি বর্তমান সময়ের সকল শাসক-ফিরাউনদের জন্যও এটি প্রযোজ্য হবে। যেহেতু বর্তমানের এ শাসকেরাও নিজেরা যা সঠিক মনে করে সেটা ছাড়া অনুসারীদের অন্য কিছু বোঝায় না। আর এই শাসকেরাও তাদের অনুসারীদের কেবল “মঙ্গলের পথই দেখায়”।

তাই আমরা যদি সুস্পষ্ট দলীল অথবা এবং ইজমা’র ভিত্তিতে তাদের তাকফির করি, তবে সেটা হবে ফিরাউনের এই কথার বিপরীত, “কেবল মাত্র আমিই তোমাদের মঙ্গলের পথ দেখাই” – যেহেতু ফিরাউনের মতোই বর্তমানের শাসকরাও বিশ্বাস করে যে তারাই মানুষকে “মঙ্গলের পথ” দেখায়। আর এসবই দৃশ্যমান, যাহির।

শারঈ’ মূলনীতির আলোকে দলিল -

শারঈ’ মূলনীতির আলোকে শাসকদের তাকফির করার ব্যাপারে ওপরের মূলনীতি দুটির ব্যাপারে দলীল হলঃ

“ইলমের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ” আলিমদের ইজমা আছে এমন একটি সুপরিচিত শারঈ’ মূলনীতি হল – “বড়দের বুঝ এবং অভিজ্ঞতা বেশি”।

দলীলসমূহ (ইস্তিকরা’) এটাই বলে যে কিছু কিছু কাজ এমন যে তা ব্যাক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়, এবং এ ব্যাপারে ইজমা’ আছে। কিন্তু, যদি শাসক এইসব কাজের (ঈমান বিধ্বংসী কাজ) কোন একটি করে থাকে, তখন ইতিপূর্বে ইজমা’ থাকা এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা হঠাৎ আমাদের একাধিক মত বা ইখতিলাফের সন্ধান দেয়।

এর দুটি উদাহরণ নিচে দেয়া হল-

প্রথম উদাহরণ - ইবনে হাযম, ইবনে কাসির এবং অন্যান্যরা বলেছেন, আইন প্রণয়ন হল শিরক এবং একজন মানুষ এটি করার মাধ্যমে মুরতাদ হয়ে যায়, এ ব্যাপারে ইজমা’ আছে। কিন্তু যখন শাসকরা ইসলামের এই মূলনীতি ভঙ্গ করে, তখন তারা মুরতাদ গণ্য হবে কি হবেনা - হঠাৎ সে ব্যাপারে দুটি মত, দ্বৈতনীতি দাঁড়িয়ে যায়।

দ্বিতীয় উদাহরণ - যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য-সহায়তা করে, তার কুফরের ব্যাপারে ইবন বায, ইবন হুমাইদ এবং অন্যান্যদের ইজমা’ আছে। কিন্তু যখন শাসক এই কুফর করে, তখন শাসক কাফির হবে কি হবে না- সে ব্যাপারে হঠাৎ দুটি মত এসে যায়।

সরকারি-দরবারী আলিমদের মতে, এগুলো হল সাধারণ মূলনীতি যা আপনাকে মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকতে হবে।

ব্যতিক্রমঃ

অবগত হোন, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, দরবারী শাইখদের এই মূলনীতির কিছু ব্যতিক্রমও হয়। আপনি যদি এ ব্যতিক্রমের ব্যাপারে না জানেন, তাহলে বিভ্রান্তি এবং স্ববিরোধিতায় পড়ে যাবেন। ব্যতিক্রমটি হল, শাসকরা যদি

ইমান বিধ্বংসী কোন কাজ করে কেবল তখনই ওপরের মূলনীতিগুলো প্রযোজ্য হবে (অর্থাৎ তার ওপর তাকফির করা হবে না)। কিন্তু তারা যদি জাতিসংঘের কোন মূলনীতি ভঙ্গ করে, তাহলে তাদের আর কোন রক্ষা নাই, তখন আর এ মূলনীতি দুটো কার্যকর হবে না, তখন তারা কাফির-মুরতাদ হয়ে যাবে।

এর একটি উদাহরণ হল সাদ্দাম হুসাইন। যতদিন সে জাতিসংঘের আইন মেনে চলেছিল, ততদিন বাথ-ইজম, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, মানবরচিত আইন, গণহত্যা – ইত্যাদি নিয়ে কোন সমস্যাই ছিল না। বরং তাকে "প্রাচ্যের দ্বাররক্ষী", "সম্মানিত যোদ্ধা", এমনকি "যুগের সালাহুদ্দিন আইয়ূবী" পর্যন্ত বলা হয়েছে। কিন্তু যখন সে জাতিসংঘের একটি মূলনীতি ভঙ্গ করে কুয়েত আক্রমণ করে বসল – নাউযুবিল্লাহ! - তখন সে আর মাসুম থাকলো না, সে দোষী হয়ে গেল। সে কাফির, মুরতাদে পরিণত হল। তাকে কাফির, মুরতাদ, বাথিস্ট, সমাজতন্ত্রী এবং জালেম স্বাব্যস্ত করা হল। অতএব, সরকারি-দরবারী আলিমদের মত অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমটি ভালোভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।